সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

০২
ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস

০৪
ঘরে শিক্ষক হিসেবে
মায়ের ভূমিকা পালনের অন্তরায়

০৬
টেকসই উন্নয়ন

০৮
মনের মুক্তির খোঁজে বই পড়া

১০
কুমিল্লায় শ্রীকাইলের “বাণী পীঠ”

১২
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কৌশল

১৪
ওমর আলীর কাব্যে ইতিহাস চেতনা

১৬
লড়াকু বিধবা মনিকার শিশুকুঞ্জ

১৮
শিক্ষিকা লুৎফা বেগম

২০
সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন

২২
স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৩
বই আলোচনা: বাদল সৈয়দের জলের উৎস

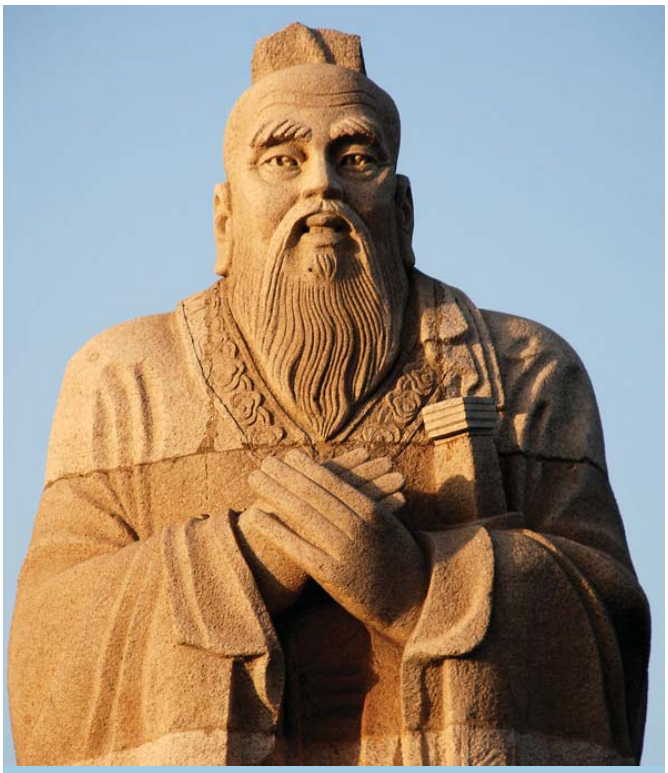

যদি তুমি ১ বছরের জন্যে ভাবো
ধান চাষ করো।
যদি তুমি ১০ বছরের জন্যে ভাবো
গাছ লাগাও।
যদি তুমি ১০০ বছরের জন্যে ভাবো
শিশুদেরকে শিক্ষা দাও।

– *কনফুসিয়াস*

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ ● ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

আরো একটি নতুন বছর আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আড়াই বছর অতিক্রমের পর শিক্ষালোকও সতেজ চেতনায় উদ্দীপ্ত। তদুপরি আমাদের বুলেটিনের চলতি সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে বিজয় মাসে। যে মাস বাঙালির সবচেয়ে গৌরবের। ২০১৬-র শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরাও আনন্দাপ্লুত। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরি 'শেকড় থেকে শিখরে' ভাস্কর্যটি প্রচ্ছদে এনে সে বিজয়ানন্দ প্রকাশ করছি।

চলতি সংখ্যায় বাঙালির বিজয়োৎসবের ছোঁয়া আছে। আছে বাংলাদেশের এগিয়ে চলারও প্রত্যয়। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গল্প। এক বছর হতে চলল পল্লীর নির্জনতা-প্রেমিক কবি ওমর আলী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর কবিতা নিয়ে এ সংখ্যায় একটি লেখা ছেপে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। কিছুদিন আগে সবার থেকে বিদায় নিলেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। এ দুজন বিশিষ্ট কবিকে একত্রে আলোকচিত্রে ধরেছিলেন একজন কবিতা-প্রেমিক। যা শিক্ষালোকের পাঠক-পাঠিকাকে দিতে পেরে আমাদের ভাল লাগছে।

আছে শিক্ষা ও সিদীপের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশ কিছু লেখা। সবাইকে শিক্ষালোকের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।

Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

shikkhalokcdip@gmail.com

শেকড় থেকে শিখরে
ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস

আলাউল হোসেন

বাঙালি জাতির আছে আন্দোলন সংগ্রামের এক দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস। যার শেকড়ে প্রোথিত রয়েছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। একসময় সেই আন্দোলন সফল হলো। আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে এলাম। এরপর দেশ ভাগ হলো। আমরা আবার পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হলাম। মুখের ভাষাও কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র হলো। ফলাফল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। এরপর ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। তারপরেই মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বর্ণালী ইতিহাস। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ আর পেলাম এক মহানায়ককে। যিনি তাঁর প্রজ্ঞা, চিন্তা-চেতনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে তুলে আনলেন ‘শেকড় থেকে শিখরে’।

একাত্তরের মহান বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে ভাস্কর্য। তেমনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও তৈরি হয়েছে নানা শিল্পকর্ম। তবে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু ও বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে পাবনার বেড়ায় নির্মিত 'শেকড় থেকে শিখরে' ভাস্কর্যটি অনেক দিক থেকে ব্যতিক্রম। ১০ ফুট উচ্চতার কংক্রিটের স্তম্ভের উপর নির্মাণ করা হয়েছে ১৮ ফুট উচ্চতার বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য। এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। বাংলাদেশে স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি এটিই বঙ্গবন্ধুর সর্ববৃহৎ আবক্ষ ভাস্কর্য। এই আবক্ষ ভাস্কর্যের দু পাশে রয়েছে তিনটি করে অতিরিক্ত স্তম্ভ। যাতে সিমেন্ট কেটে অঙ্কিত হয়েছে '৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উত্থান-পতন এবং উন্নয়নের ধারা। মূল ভাস্কর্যের এক পাশে ২৬টি কলামের একটি সীমানা বেষ্টনী রয়েছে, যার প্রত্যেকটি কলামে টাইলসে এনগ্রেভিং করা হয়েছে বাংলার ইতিহাস। যেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সিরাজউদ্দৌলা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের সচিত্র ইতিহাস।

বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের পথে সমগ্র জাতির সঙ্গে একই কাতারে পাবনার বেড়া অঞ্চলের হাজারো মানুষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাস সনাক্ত করে উপজেলার ডাববাগান যুদ্ধই একাত্তরে প্রথম সংঘটিত সম্মুখযুদ্ধ। এ কারণেই পাবনা জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসংবলিত উল্লেখযোগ্য একটি স্থাপনা এলাকাবাসীর প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছিল। তাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অমর স্মৃতি জাগরিত করে রাখার উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনসহ নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলার সঠিক ইতিহাস সদা উদ্ভাসিত রাখার প্রয়াসে এ ধরনের একটি স্থাপনা নির্মাণ সময়োচিত সিদ্ধান্ত। শিল্পী বিপ্লব দত্ত এর নকশা প্রণয়ন করেন এবং প্রায় দেড় বছর নিরলস পরিশ্রমের পর নির্মাণ করেন বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এ ভাস্কর্য। এটি পাবনার বেড়া উপজেলার নগরবাড়ি ঘাটের অদূরে নাটিয়াবাড়িতে নগরবাড়ি-পাবনা মহাসড়ক সংলগ্ন ধোবাখোলা করোনেশন স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান ফটকের পাশে স্থাপিত।

এ প্রসঙ্গে স্থপতি বিপ্লব দত্ত বলেন, "বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন করে জন্ম নেয়া একটি স্বাধীন দেশ। এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে ভাষার জন্য। অস্তিত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির জন্য সংগ্রাম করেছে। নতুন প্রজন্ম এ সংগ্রাম দেখেনি। বই পড়ে ও বড়দের কাছে গল্প শুনে মনের ভেতরে একটা আবছা ছবি তৈরি করেছে স্বাধীনতা নিয়ে। তাই বাংলার সঠিক ইতিহাস ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে তুলে ধরাই এ ভাস্কর্যের মূল থিম। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার চেতনাকে প্রবাহিত করা এবং চোখের সামনে বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই আমি আমার সর্বোচ্চ শ্রমটুকু দিয়েছি এটির নির্মাণ কাজে। তাছাড়া নিজের এলাকায় কাজটি করতে পেরেও আমি গর্ববোধ করি।"

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ফজলুল হক মাস্টার বলেন, কোনো জাতির গৌরবগাথা ধরে রাখে তার শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাস। শিল্পীর আবেগ মূর্ত হয়ে ওঠে রঙ-রেখায় ও পাথর খোদাইয়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পকর্মও গৌরবোজ্জ্বল মুক্তি সংগ্রামের কথা বলে। ভাস্কর্যটি জাতীয় জীবনে নান্দনিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ধোবাখোলা করোনেশন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক বলেন, মানুষের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য এ ভাস্কর্য নির্মাণ করতে যে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাতে নতুন প্রজন্ম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে ইতিহাসের সঠিক পাঠ নিতে পারবে।

ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক খন্দকার আজিজুল হক আরজু এমপি বলেন, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হলেও এর পেছনে রয়েছে এক গৌরবময় দীর্ঘ ইতিহাস। নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, সুবিশাল পরিসরে নির্মিত এ ভাস্কর্য একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি বাড়িয়ে দেয় ঐতিহ্যবাহী নগরবাড়ি ঘাটের গৌরব। প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী ও হাজারো যাত্রী মুক্তিযুদ্ধের এ ভাস্কর্যের সামনে দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে তাকান। শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও জাগরণের মধ্য দিয়ে মানুষজন এ ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে যেন দেখে বাংলাদেশকেই। বহুদূর থেকে দৃশ্যমান এ ভাস্কর্যের আবেদন বহুমাত্রিক।

লেখক
শিক্ষক ও সাংবাদিক

ঘরে শিক্ষক হিসেবে
মায়ের ভূমিকা পালনের অন্তরায়

আলমগীর খান

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে পরিবারে বাবা-মা শিক্ষিত তাদের সন্তানরাও পড়ালেখায় অনেক এগিয়ে যায়। কিন্তু পরিবারে বাবা-মা শিক্ষিত না হলে সন্তানরা শুরু থেকেই একটা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে, পড়ালেখায় তাদের পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। নিরক্ষর পরিবারের শিশুরা অনেকেই বেশি দূর এগোতে পারে না। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবনে পরিবারে বাবা-মা শিক্ষিত হওয়ার যে ফল, তা ইউনেস্কার '২০১৫-পরবর্তী টেকসই উন্নয়নের শুরু শিক্ষা দিয়ে' শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে দেওয়া তথ্যে পাওয়া যায়। দেখা যায়, বাবা-মা শিক্ষিত হলে, সন্তানরা বেশি দূর পর্যন্ত পড়ালেখা করে। স্কুল-কলেজে পড়ালেখার যে প্রতিযোগিতা তাতে নিরক্ষর পরিবারের শিশুরা শিক্ষিত পরিবারের শিশুদের কাছে সবসময়ই হারতে থাকে।

> বাবা-মা শিক্ষিত কিন্তু ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারেন না, কেননা তাদের ক্লাসের বই তারা বুঝতে পারেন না। ক্লাসের বই বুঝতে না পারার কারণ তাদের পড়া বই ও এখনকার ছেলেমেয়ের বই এক নয়। বদলে গেছে ও ফি বছর বদলায়। আরেক কারণ, এখনকার পরীক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষায় প্রশ্নের ও উত্তরের ধরন তাদের সময়কার মতো নয়

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছে, যদিও তা এখনো কাঠামোগতভাবে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়নি। আমরা যদি এখন ক'বছর আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার দিকে তাকাই, তাহলে একটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যখন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের স্কুলে ছিল না, তখনও ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তানরা ঠিকই পরিবারে একটা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে যেত। অন্যদিকে গরিব ও নিরক্ষর পরিবারের সন্তানরা এই প্রাক-প্রাথমিকের প্রস্তুতি ছাড়াই প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতো। নিশ্চয়ই অনুমান করা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণি থেকেই দরিদ্র-নিরক্ষর পরিবারের শিশুদের পিছিয়ে পড়া শুরু হতো। পুরো স্কুলজীবনেই নিরক্ষর পরিবারের শিশুর পক্ষে শিক্ষিত পরিবারের শিশুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ত। নিরক্ষর পরিবারের শিশু ও শিক্ষিত পরিবারের শিশুর মধ্যে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবধান ঘোচাতে হলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গরূপে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। জরুরি মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যতের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুলজীবনে বাড়ির সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

সব মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের সন্তানও পড়ালেখায় এগিয়ে যাবে– এ পুরনো কথা। সরকারও সে চেষ্টা করছে। তাহলে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার কারণ কী? কারণ হলো, সরকার শিক্ষিত মায়েদের নিজ ঘরে শিক্ষিকা হিসেবে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যটি নিয়ে মেয়েদের শিক্ষা বাড়াচ্ছে না। সরকারের লক্ষ্যের মধ্যে এটা না থাকলে, সব মেয়ে শিক্ষিত হওয়ার পরও একশ শতাংশ শিক্ষিত জাতি পাওয়া নিশ্চিত হবে না। প্রমাণ হচ্ছে, এখনো যেসব বাবা-মা শিক্ষিত আছেন, তারা পরিবারে শিক্ষক হিসেবে তাদের যে কাঙ্খিত ভূমিকা তা পালন করতে পারছেন না। নিজেদের অসচেতনতার কারণে ততটা নয়, যতটা শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ কাঠামোগত রূপের কারণে। শিক্ষাব্যবস্থার এমন বিশেষ রূপ যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন মা শিক্ষিত হয়েও তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবেন না।

শিক্ষিত বাবা-মা কেন পরিবারে তাদের কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারেন না? হতে পারে এসব কারণ: এক. দুজনই চাকরিজীবী-কর্মজীবী বলে ছেলেমেয়েকে পড়ালেখায় সহায়তা করার সময় পান না। দুই. দরিদ্র কর্মজীবী বাবা-মা দিনের কাজের শেষে একটু বিশ্রাম ও আনন্দদায়ক কোনো অবসর খোঁজেন বলে সন্তানের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারেন না। এ দুটি ব্যাপারে সরকারের করণীয় হয়তো সামান্য। তবুও সবক্ষেত্রে আট ঘণ্টার কর্মদিবস নিশ্চিত করা গেলে এক্ষেত্রেও ইতিবাচক

ফল পাওয়া যাবে। তিন. শিক্ষিত বাবা-মা পড়ালেখা চর্চার অভাবে এখন বেশিরভাগই ভুলে বসে আছেন। চার. বাবা-মা শিক্ষিত কিন্তু ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারেন না, কেননা তাদের ক্লাসের বই তারা বুঝতে পারেন না। ক্লাসের বই বুঝতে না পারার কারণ তাদের পড়া বই ও এখনকার ছেলেমেয়ের বই এক নয়। বদলে গেছে ও ফি বছর বদলায়। আরেক কারণ, এখনকার পরীক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষায় প্রশ্নের ও উত্তরের ধরন তাদের সময়কার মতো নয়। পড়ানোর ধরন অনেকখানি পরীক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষায় প্রশ্নের ও উত্তরের ধরনের ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বাবামা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন হিমশিম খান, ছেলেমেয়েও তেমনি বাবা-মার কাছে পড়তে আগ্রহ হারিয়ে নোটবই এবং কোচিং-প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়।

এই চার নম্বর সংকট দূর করতে সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। এছাড়া সামান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তিন নম্বর সংকটও দূর করা যায়। এ কয়েকটি সংকট দূর করতে পারলে রাষ্ট্র বিনা পয়সায় এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষক পেয়ে যাবে। যাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব থাকবে না। যাদের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে পিছনে ইন্সপেক্টর লাগিয়ে রাখতে হবে না। যারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকে এই বিরাট সেবা দিবে যার জন্য কোনো বেতন-পেনশন-অবসর সুবিধা চাইবে না। তারা শিক্ষক পদমর্যাদাও দাবি করবেন না। সরকার যে প্রাইভেট-কোচিং-গাইডবই বন্ধ করতে হিমশিম খাচ্ছে, তা সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিরাট শিক্ষক বাহিনী অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সাজানোর বেলায় এই বিপুল সম্ভাবনাটি মাথায় রাখলেই তা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষাপদ্ধতি, প্রশ্নোত্তরের ধরন এসব পাল্টানো যাবে না বা দরকার নেই? অবশ্যই পাল্টাতে হবে, কিন্তু তাতে দায়িত্বজ্ঞান থাকতে হবে। রাতারাতি বিরাট পরিবর্তন আনার কোনো দরকার নেই। হঠাৎ বিরাট পরিবর্তনসহ যেসব পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হয়, তাতে বিষয়বস্তুর ও মুদ্রণের ব্যাপক ভূল থাকে, যা নিয়ে পত্রপত্রিকায় অভিযোগের শেষ নেই। উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি পরিবর্তন তো রীতিমতো একটা এক্সপেরিমেন্ট। ছাত্রছাত্রী যেন গিনিপিগ। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষিত বাবা-মা কেন, স্কুলের শিক্ষকরাই তো তাল মিলাতে পারেন না, নতুন নতুন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সমুদ্রে সবাই খাবি খেতে থাকেন। পরিবর্তিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাঁতার শিখতে না শিখতেই আবার নতুন পরিবর্তনের বিরাট ঢেউ এসে তাদের ডুবিয়ে দেয়। এভাবেই চলতে থাকে। পরিবারে শিক্ষিত বাবা-মা ছেলেমেয়েকে গাইডবই-কোচিং-প্রাইভেটের হাতে ছেড়ে দিয়ে অসহায়ত্ব থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন।

পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষাপদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তরের ধরন ইত্যাদিতে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না। কিন্তু সে পরিবর্তন যদি হঠাৎ না হয়ে নিয়মিত হয়, তবে তা গাছের বৃদ্ধির মতোই কারো চোখেও পড়বে না। তাছাড়া, বড় পরিবর্তনের আগে শিক্ষক সমাজ ও অভিভাবকদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা হওয়া দরকার। তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও পরামর্শকে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে ছোটখাটো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবাইকে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

লেখাটি ডেইলি অবজার্ভার (১০ আগস্ট ২০১৬) ও প্রতিদিনের সংবাদ (২২ আগস্ট) পত্রিকায় প্রকাশিত। এখানে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পুনর্মুদ্রিত হলো।

লেখক

টেকসই উন্নয়ন

আবু খালেদ

উন্নয়নের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, উন্নয়ন অর্থ ভালোর দিকে পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। যা বস্তুগত ও মানসিক উভয় ব্যাপার। কোন সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন বা উন্নতি হওয়াই হলো উন্নয়ন। এখন টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়। সেটা কী? ১৯৮৭ সালে টেকসই উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের দক্ষতায় আপোষ না করে যে উন্নয়ন বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম তা-ই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন।" টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি ছাড়া উন্নয়ন স্থায়ী হয় না। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দেশজ সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হয়। এসব সম্পদ হচ্ছে মানবসম্পদ, ভৌতসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ।

ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে ২০১২ সালের জুন মাসে ১৯২টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রিও+২০ ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৯২ সালে এখানেই "ধরিত্রী সম্মেলন" হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত "এজেন্ডা-২১"-এ টেকসই উন্নয়নের নিম্নরূপ সংজ্ঞা হয়, "টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক বিকাশ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সমন্বিত ব্যবস্থা এবং এটি বাস্তবায়িত হতে হবে মানুষকে কেন্দ্র করে।" তার বিশ বছর পর পুনরায় এমন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এর নাম রিও+২০ হয়েছে। যে দলিলে এ ঘোষণা আসে তাতে বলা হয়, "আমরা কেমন ভবিষ্যৎ চাই।"

বাস্তবে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় যাতে বলা হয় টেকসই অর্থনীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যেক দেশ সবুজ অর্থনীতি অর্জন করবে এবং এ লক্ষ্যে তাদের জাতীয় নীতিমালা বিবেচনা করবে। তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তা হচ্ছে অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির রোল মডেল। জতিসংঘ এমডিজির লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, "আমরা এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছি। এখন এই সফলতাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে

জাতিসংঘের অধিবেশনে রিও+২০ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ আসন বিশিষ্ট "ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ" গঠন করা হয় যারা ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন বিষয় ও প্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে। এই ৩০টি আসনে ৬৯টি রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত নানা বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে "ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ" ২৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সূচক সম্বলিত একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সময় কাঠামো নির্ধারণ করা হয় ২০১৬-২০৩০– এই ১৫ বছর।

জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তিন দিনের সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা এসডিজি) আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করাসহ উন্নয়নকে টেকসই করতে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বা এসডিজি গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সূচক রয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিশ্বে এখনো প্রায় ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র। যাদের দৈনিক আয় মাত্র ১ ডলার ২৫ সেন্টেরও কম। এসব মানুষ প্রতিদিন গড়ে বাংলাদেশের ১০০ টাকারও কম আয় দিয়ে কোনরকমে বেঁচে আছে। তবে আশা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে এ ধরনের মানুষ আর থাকবে না। কারণ তাদের অতি দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের করে আনতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। উক্ত সংস্থার মতে, ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে অর্ধেকে নেমে এসছে। এটি একটি অসাধারণ অর্জন হলেও এখনো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন চরম দরিদ্র। এসব মানুষের অধিকাংশই বসবাস করে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায়। তার চেয়ে কিছু বেশি আয় নিয়ে বাঁচতে হচ্ছে আরো কোটি কোটি মানুষকে। এছাড়াও অনেক মানুষ আছে যাদের অবস্থা এক সময় কিছুটা ভাল হলেও তারা আবার দারিদ্র্যের বলয়ে ফিরে আসছে।

পৃথিবীর ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর বা নাজুক ও সংঘাতকবলিত দেশগুলোতেই দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বে বর্তমানে ৫ বছরের কম বয়সী প্রতি ৭টি শিশুর মধ্যে ১ জনের উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম। এছাড়া সংঘাতের কারণে গত বছরে প্রতিদিন ৪২ হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে।

দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবন জীবিকায় ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষুধা ও অপুষ্টির মাত্রা বেড়ে যায়। শিক্ষাসহ মৌলিক সেবাগুলো পাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফলে সামাজিক বৈষম্য বাড়ে। সে জন্য সংস্থাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পরামর্শ দিয়েছে। যাতে মানুষের কর্মসংস্থান টেকসই হয় এবং সমাজে সমতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি) অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির রোল মডেল। জতিসংঘ এমডিজির লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, "আমরা এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছি। এখন এই সফলতাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই আমাদের অর্জন বা উন্নয়ন টেকসই হবে।" তিনি আরো বলেন, এসডিজির জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনায় সুশাসনকে গুরুত্ব দিতে হবে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন যেমন আছে, তেমনি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আনার কর্মসূচিও আছে। এসডিজি লক্ষ্য পূরণ একইসঙ্গে বাংলাদেশের জন্য অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, আবার কিছু চ্যালেঞ্জও হাজির করেছে।

"বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপরিমেয়" এ সত্যকে বাস্তবায়ন করতে হলে দুটি বিষয়ে জোর দিতে হবে। প্রথমত, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা; ও দ্বিতীয়ত, সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে সবার জন্য সমান অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের প্রয়োজনে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়াতে হবে। সকল জনগোষ্ঠির মধ্যে তার সুফল পৌঁছাতে পারলেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

লেখক
সিদীপের ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)

মনের মুক্তির খোঁজে বই পড়া

অলোক আচার্য্য

বই পড়া কাজটির অনুভূতি একেকজনের কাছে একেকরকম। বই পড়াকে কাজ বলছি কারণ ছাত্রজীবনে অনেকেই একে অত্যন্ত ভারী এবং জীবনযাপনের অতিরিক্ত অংশ হিসেবেই দেখে থাকি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পড়া, পরীক্ষা এসব অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। তারা বাবা-মা বা মাস্টারমশাইয়ের ঠেলায় পড়ে অথবা ফলাফল ভালো করার আশায় পড়ে। তবে শুধু বিনোদনের অংশ হিসেবে পড়ার মনোভাব গড়ে তুলতে অনেকেরই জীবনের একটি বড় অংশ পার হয়ে যায়। কারো কারো জীবনে সেটা হয়েও ওঠে না। চাকরি জীবনে প্রবেশের আগেও সে বই পড়ে শুধু চাকরি পাওয়ার জন্যেই। বই পড়ার উদ্দেশ্যই যেন একটা ভালো রেজাল্ট করা অথবা চাকরি পাওয়া। কিন্তু একথা ঠিক যে যারা শুধু মনের আনন্দে বই পড়ে তাদের চাকরির উদ্দেশ্যও সফল হয়, সেই সাথে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টিও অর্জিত হয়। বই পড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে না চললে বই পড়া বিষয়টি বিরক্তিকর ও একঘেঁয়ে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যারা অভ্যাসবশত বই পড়ে তারাই কেবলমাত্র বইয়ের সাথে থাকে। বাকিরা বই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার ছাত্রজীবনে বই পড়ার তীব্র নেশা থাকলেও পরবর্তী জীবনে সে অভ্যাস মরে যেতে পারে। অনেকেরই আবার সে অভ্যাস আরো তীব্র হয়। তবে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষত্রেই বই পড়া আনন্দহীন হয়। একথা নিশ্চিত যে, পাঠে যদি আনন্দ না থাকে সে পাঠদান এবং পাঠগ্রহণ সার্থক হয় না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই করতে হয়। কেননা তার পাঠদানের সফলতা ও ব্যর্থতার উপরই উপস্থিত শিক্ষার্থীর সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। শিক্ষকের পাঠদানে ব্যর্থতা শুধু একজন শিক্ষকের ব্যর্থতা নয় বরং তা তার ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতা। শিক্ষকের কাজই তো ছাত্রছাত্রীদের ভেতর বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ থাকে আনন্দপাঠ বইয়ের ক্লাসের প্রতি কারণ এই বইয়ে গল্প থাকে। তাই অন্যান্য পাঠ যদি গল্পের আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে হয়তো পাঠদান আরও বেশি ফলপ্রসূ হতো।

পাঠদান এবং পাঠগ্রহণ আমার কাছে অনেকটা মোবাইল যন্ত্রে কথা বলা এবং শোনার মত মনে হয়। যেমন বক্তার কথা যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে শ্রোতা শুনতে পায় না। আবার শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রদ্বয় যদি খারাপ থাকে তাহলেও কথা বলা অর্থহীন হয়। অর্থহীন বাক্যালাপে কোন সুফল আসে না। মোবাইল নির্ভর হওয়ার কারণে বর্তমান প্রজন্মের একটি বড় অংশই সারাক্ষণ সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মোবাইল ফোনে চ্যাটিং আর কানে ব্লুটুথ নামক আধুনিক যন্ত্র। বিনোদনের এক পারফেক্ট মাধ্যম। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বই পড়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ বই পড়ার চেয়ে বড় কোন বিনোদনের মাধ্যম আছে বলে আমার জানা নেই। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বই সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে কিছু মানুষের প্রথম পছন্দ ছিল। আজকাল যেমন এক জায়গায় বেড়াতে গেলে সাথে করে সময় কাটানোর জন্য মানুষ মোবাইল, ল্যাপটপ বা অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে যায়, আগে আমরা সাথে ঠিক গোটাকতক গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে নিতাম যাতে সময়টা ভালো কাটে। একথা ঠিক যে আমাদের প্রযুক্তির সাথে এগুতে হবে। কিন্তু প্রযুক্তির সাথে চলতে গিয়ে সময়ের বড় অংশ অপচয় হবে এটাও কাম্য নয়।

আজকাল বই পড়ার অভ্যাস কমে গেছে। আমার কাছে মনে হয় ভালোই কমে গেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোতে কিন্তু বই পড়ার সহজলভ্যতা আরো বেশি হয়েছে।

আগে যেমন হেঁটে গিয়ে লাইব্রেরি থেকে বই কিনতে হতো এখন আর এত কষ্ট করতে হয় না। এখন শুধু বইয়ের নামটা লিখে সার্চ দিতে হয়। এরপর পছন্দমত সাইটে গিয়ে ডাউনলোড করে নিলেই মিটে গেলো। কিন্তু এই সহজ কাজটাই আজ অনেক কঠিন হয়ে গেছে। কাগজের বইয়ে যেমন প্রাকৃতিক স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যেত সেসব তো আর এই যন্ত্রতে মেলে না। নতুন বইয়ের গন্ধের কথা কেইবা ভুলতে পেরেছি। কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। বই হলো জ্ঞানের আদি ও অকৃত্রিম উৎস। সীমাবদ্ধ জ্ঞান জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের কোন সীমা নেই। এটি অনবরত সম্প্রসারণশীল। তাই জানার মোক্ষম উপায় হলো পড়া। বই পড়াকে তাই আনন্দের সাথে নেওয়ার চেষ্টা করাই উত্তম। এতেই জাতির মঙ্গল। সাহিত্য-প্রিয় জাতি কোনদিন মাথা অবনত করে সারা জীবন থাকে না বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়ে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হলে শত্রু রত্নভাণ্ডার থেকে কত রত্ন গায়ের জোরে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু সেসব কতদিন তারা ভোগ করে? কোন জিনিস চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করা গেলে তা একমাত্র সে দেশের সৃষ্টিকর্ম, সাহিত্য। বই পড়ায় মানবজাতির সব থেকে বড় মঙ্গল। এমনকি তা মহামূল্যবান ধনসম্পদ দিয়েও পরিমাপ করা যায় না। তা কোনদিন হারানোর নয়। মানবজাতির মুক্তির রহস্য লুকিয়ে আছে জ্ঞানের মুক্তিতে। আর জ্ঞানের মূলমন্ত্র লুকিয়ে আছে বইয়ের ভেতর। তাই বই পড়াতেই প্রকৃত মুক্তি। মুক্তির সে রহস্য যে বুঝতে পেরেছে সে কোনদিন বই ছাড়তে পারেনি। সে বইকে আগলে রেখে ছেড়েছে সমাজের সকল অপকর্ম, ঘৃণা করতে শিখেছে জুলুমকারীদের। আর যে বই ভুলেছে সে তার জীবনের সব থেকে বড় বন্ধুকে ভুলেছে। কারণ বই হলো মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, যে সারাজীবন প্রকৃত বন্ধুর মতই পাশে থেকে উপদেশ দেয় ও সাহায্য করে।

লেখক

গান

কথা ও সুর: মোঃ শাহপরান চৌধুরী সুজন
হিসাব রক্ষক, সলিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ, সিদীপ

থাকব না আর গরীব মোরা, রব না নিরক্ষর
উন্নয়নের মন্ত্র নিয়ে কাছে এলো মোর
এলোরে এলোরে এলো সিদীপ জননী
আয়রে আয় সবাই আয় ছুটে এখনি।

থাকব না আর অনাহারে, ফিরে আসবে সুদিন
ভাগ্য চাকা ঘুরাবো মোদের নিয়ে সহজ ঋণ
এলোরে এলোরে এলো সিদীপ জননী
আয়রে আয় সবাই আয় ছুটে এখনি।

থাকবে না আর নিরক্ষর, আমাদের কোন সন্তান
শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে বাড়াতে জীবনের মান
এলোরে এলোরে এলো সিদীপ জননী
আয়রে আয় সবাই আয় ছুটে এখনি।

ভুগবো না আর রোগে শোকে, অকালে হারাবো না প্রাণ
স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মোদের রক্ষা করতে জান
এলোরে এলোরে এলো সিদীপ জননী
আয়রে আয় সবাই আয় ছুটে এখনি।

থাকব না আর আলোবিহীন, কাটাতে অন্ধকার
মোদের ঘরে আলো দিতে নিয়ে এল সোলার
এলোরে এলোরে এলো সিদীপ জননী
আয়রে আয় সবাই আয় ছুটে এখনি।

লেখক

আলোকিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লায় শ্রীকাইলের "বাণী পীঠ"

মোহাম্মদ আলী

কুমিল্লার সর্বউত্তরের একটি গ্রাম শ্রীকাইল। গ্রামটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ মুরাদনগর উপজেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১নং শ্রীকাইল ইউনিয়ন। এ অঞ্চল কিছুটা সমতল ও ভাটি হওয়ার কারণে বছরে অন্তত ৬ মাস ফসলের মাঠ ৮/১০ ফুট পানির নিচে তলিয়ে থাকত। এটি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে। এ পরিবেশে ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সংগ্রামী কর্মবীর ডা. নরেন্দ্র নাথ দত্ত। অভাব-অনটনে বড় হওয়া এই মানুষটি শিক্ষা ও জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেও নাড়ির টানে প্রায় সময় ফিরে আসতেন তার জন্মভূমিতে।

তার পিতার নাম কৃষ্ণ কুমার দত্ত ও মাতার নাম শর্বানী সুন্দরী দেবী। তাদের সংসারে তিন সন্তান– কামীনি কুমার, সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্র নাথ দত্ত। মায়ের মৃত্যুর পর নরেন্দ্র নাথের সংগ্রামী জীবন শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে নরেন্দ্র নাথ দত্ত ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কুমিল্লা জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এসময় ময়নামতি থেকে সবজি এনে বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করতেন। ১৯০৬ সালে এ আত্মপ্রত্যয়ী তরুণটি প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯০৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ২৫০ টাকা সম্বল নিয়ে তিনি কলকাতা যান এবং ১৯০৯ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি রাত জেগে খিদিরপুর ডকে কুলির কাজ করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। তার অধ্যবসায়ের কথা জানতে পেরে কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল ক্যালভার্ট তাকে আর্থিক সাহায্য দেন। ১৯১৫ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন।

কর্নেল ক্যালভার্টের সুপারিশে তিনি ইন্ডিয়ান ইমার্জেন্সি ওয়ার সার্ভিসে কমিশন লাভ করেন। কলকাতার রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে অস্থায়ী সহকারি সার্জন পদে যোগদান করেন। পরে ব্রিটিশ ভারতীয় মেডিকেল কোরে চাকরি শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ও পরে অধিকাংশ সময় তাকে মধ্যপ্রাচ্যে কাটাতে হয়েছে। মেডিকেল কোরে ক্যাপ্টেন পদে থাকা অবস্থায় তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতি নেন। তারপর তিনি বেঙ্গল ইমিউনিটি নামে একটি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি এ কোম্পানির নির্বাহী পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন। মেডিকেল কোরে ক্যাপ্টেন পদে থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর থেকে তিনি ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

চাকরি জীবন শেষ করে তিনি চাকরির মাধ্যমে অর্জিত অর্থসম্পদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। শুদ্ধ ব্যবসা আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হন। চিরকুমার এই মহৎ হৃদয়ের মানুষটি তার সকল অর্থ শিক্ষাসহ জনকল্যাণমূলক কাজে বিলিয়ে দেন। জীবদ্দশায় তিনি ঔষধ শিল্প, মৎস্য শিল্পসহ নানারকম ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৬ এপ্রিল এ মহান মানুষটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগের বছর ডিসেম্বরে তিনি শ্রীকাইল গ্রামে এসেছিলেন– যা তার শ্রীকাইল গ্রামে শেষ আসা।

১৯৩৫ সালে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত তার জন্মভূমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। ১৯৩৯ সালে শ্রীকাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং ১৯৪১ সালে শ্রীকাইল কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে কলেজটির অট্টালিকা ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। শ্রীকাইল কলেজটি কুমিল্লার শান্তি নিকেতন নামে পরিচিত হয়।

এই কলেজ ক্যাম্পাসে এসে প্রায় সকল শিক্ষার্থী মায়ার বাঁধনে পড়ে যায়। মনোরম পরিবেশ ও আকর্ষণীয় স্থাপনা

এই কলেজটিকে সুন্দর করে তুলেছে। কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে একটা বড় দিঘী। দিঘীর পূর্ব পার্শ্বে লাইব্রেরি ও উত্তর পার্শ্বে কলেজের তিনতলা বিশিষ্ট মোঘল আমলের মূল ভবন। দিঘীর পশ্চিম পাশে ৩ তলা অতিথি ভবন বর্তমানে যা অধ্যক্ষ ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিটি তলার উচ্চতা ২০ ফুট যার কারণে গরমের সময়ও কক্ষের ভেতরটা অনেক ঠাণ্ডা থাকে। ক্যাম্পাসের ভেতরে রয়েছে ছাত্রী হোস্টেল, মিলনায়তন, মসজিদসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা। আরও রয়েছে বিজ্ঞানাগার, বিশাল লাইব্রেরি, শহীদ মিনার, ব্যাচেলার কোয়ার্টার, কলেজ স্টাফ কোয়ার্টার ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তর আবক্ষ মূর্তি। দিঘীর পশ্চিম ও উত্তর পাশে রয়েছে ২টি শানবাঁধানো ঘাট। কলেজ ক্যাম্পাসের বাহিরে অনেকগুলি স্টাফ কোয়ার্টার আছে। কলেজের মালিকানায় ৫টি পুকুর ও ১টি বাজার ছাড়াও রয়েছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি।

কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ৫২ জন ছাত্র নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম বর্ষে কোন ছাত্রী ছিল না। তবে ২০০০ সালে ছাত্রী সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪০০ জন। এ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড. অতীন্দ্রনাথ বসু, এমএ ট্রিপল (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)। এছাড়া ড. অনীল ভট্টাচার্য্য ও ধীরেন্দ্রনাথ দাসের খ্যাতি ছিল দেশজুড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কৃতি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী অরুণ দত্ত যিনি ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলায় (আসামসহ) এইচএসসি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এছাড়া কাজী আবু তাহের, আবু বক্কর সিদ্দিক, কামরুল হাসান, রেজাউল করিম, ফুয়াদ হাসান সরকার, সাকিনা আক্তার ও আয়েশা কৃতি ছাত্রছাত্রী ছিলেন। এ কলেজেরই ছাত্র যাদেরকে অতি সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হয় তারা হলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোরশেদ মোল্লা, মোঃ হাসান ও বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকী।

এ কলেজের শুরুর দিকে অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন পিএইচডি-সম্পন্ন অধ্যাপকবৃন্দ যারা বেশির ভাগ ছিলেন কলকাতার। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কারণে কলকাতার শিক্ষকগণ একসাথে চলে যাওয়ায় প্রথমবার কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কলেজটি চালু হলেও ১৯৫৬ সালে এটি দ্বিতীয়বারের মত বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৭ বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৬৩ সালে সুনাকান্দার পীর সাহেব হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফি সাহেব ও মুরাদনগরের এ্যাডভোকেট হারুন অর রশিদ এমপিসহ এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী এ্যাডভোকেট মফিজ উদ্দিন আহমেদের কাছে শ্রীকাইল কলেজটি চালু করার জোর দাবী জানান। সকলের দাবীর মুখে শিক্ষামন্ত্রী কলেজটি চালু করার ঘোষণা দেন।

তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত কলেজটি সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কলেজের যারা ছাত্র ছিলেন তারা বেশিরভাগ দরিদ্র ঘরের। তারা পায়ে হেঁটে লুঙ্গি পরে কলেজে আসতেন। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট ও ভাল শিক্ষাব্যবস্থা শ্রীকাইল কলেজকে আরও আলোকিত করেছে। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন তার ফসল এ অঞ্চলের মানুষ আজও ভোগ করছেন। এছাড়া ৭৫ বছর পর বর্তমানে শ্রীকাইল ডিগ্রী কলেজটি সরকারিকরণ হয়েছে।

কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি ও সরকারিকরণ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। এখানে কলেজের সকলের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন: "ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম না হলে আমি শ্যামা প্রসাদ ভট্টাচার্য হতে পারতাম কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সবাই জানে পান্তাখাওয়া লুঙ্গিপরা ছেলেমেয়েদের জন্য। আমিও সেই ঘরের সন্তান। ... এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমার একটি আবেদন, শ্রীকাইল কলেজ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে আমরা যেমন ধন্য হয়েছি, তোমরা এই কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করে নিজেকে একেকজন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের সৈনিক হিসেবে পরিচিত করবে। দেশমাতৃকার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করবে।"

আশা করা যায়, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ আরো প্রশস্ত হবে এবং এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

লেখক শ্রীকাইল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও সিদীপের অ্যাডমিন. অ্যাসিস্ট্যান্ট

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কৌশল

এইচ এম তারেকুল ইসলাম

শুধু নিজের জন্য না, কিছু করতে হবে আমার চারপাশের মানুষের জন্যও। ইচ্ছাটা জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয় সিদীপে এসে। ভোলাচং ব্রাঞ্চে আমার যোগদান ৫ই মার্চ ২০১৫ সাল। সেদিন থেকেই জানতে পারি ২০০৫ সাল থেকে সিদীপ ভোলাচং ব্রাঞ্চের বিভিন্ন গ্রামে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার জন্য কাজ করছে। বিভিন্ন গ্রামের বাড়ির খোলা মাঠে চটে বসে এই স্কুলের পাঠ দান চলে। সপ্তাহে ৬ দিন শনি থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা হতে ৫টা পর্যন্ত পাঠদান চলে। সিদীপের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে অনেকেই। পূর্বে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই ভাবছিলাম কীভাবে সংস্থার এই কর্মসুচি এগিয়ে নিবো। নিজের চিন্তাভাবনা থেকে পরিকল্পনা করতে থাকি। সিদীপ স্কুল, স্কুলের শিক্ষিকা, শিশুদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। গ্রহণ করি নতুন নতুন উদ্যোগ। দিন কাটে ব্যস্ততায়। আমি সবসময় প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। অন্যের চেয়ে ভালো কিছু করার চেষ্টা সবসময় থাকে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কিছু স্কুল পরিবর্তন করে নিজের মত করে ভোলাচং ব্রাঞ্চে ২০টি স্কুল গড়ে তুলি। স্কুলগুলোর পরিবেশ ও শিক্ষিকাদের যোগ্যতা-দক্ষতা উন্নয়নে এবং স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিয়ে কাজ করি। প্রথমত আমি আমার স্কুলগুলোর পরিবেশের উপর লক্ষ্য রেখেছি, যেমন বসার স্থান সুন্দর দেখে স্কুলের স্থান নির্বাচন করেছি। দ্বিতীয়ত লক্ষ্য রেখেছি, স্কুলের শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আচার-আচরণ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে যেন নিয়োগ দেওয়া হয়। তৃতীয় যে কাজটা আমি করি তা হলো, সংস্থার নিজস্ব অর্থে পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিকে সমাজে ব্যাপক পরিচিত করা এবং শিসক যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

স্কুল ধরে রাখা, স্কুলের শিক্ষিকা ধরে রাখা, স্কুলে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখা, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করা, অভিভাবকদের উৎসাহিত করা ইত্যাদি কাজগুলো আমি দায়িত্ব নিয়ে করি। স্কুল পরির্দশনে যখন যাই যেন উৎসব পড়ে যায় পুরো গ্রামে। পড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয় খেলাধুলাও। এতে করে হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাগুলো তারা জানতে পারে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাদের পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। মাদকাসক্তির খারাপ দিকগুলো তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ব্যায়াম করানো হয়, যেমন সকল ছাত্রছাত্রী কোমরে হাত দিয়ে প্রথমে আস্তে আস্তে বসে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে আসে, এভাবে আনন্দ করা হয়। শিশুদেরকে বিভিন্ন অভিনয় করে দেখানো এবং শিখানো হয়। দাদী-নাতির ঝগড়া, শব্দ করে হাসি, শব্দ ছাড়া হাসি, শব্দ করে কান্না, শব্দ ছাড়া কান্না, ফ্যাশন শো, মুক্তিযুদ্ধ, বাল্যবিবাহ. যৌতুকের খারাপ দিক, ধূমপানের খারাপ দিক ও বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক নাটিকা তৈরি ইত্যাদি করা হয়।

খেলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে তোলা যেমন, ছাত্রছাত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে রেলগাড়ি বানিয়ে বলতে হবে– রেল এখন চলবে। রেল চলতে চলতে হাত উঁচিয়ে আবার

আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিকা, অভিভাবক, এলাকার মুরুব্বি, জনপ্রতিনিধি, ব্রাঞ্চের সকল সহকর্মী সবাই মিলে আমরা একটা টিম। প্রত্যেকের আন্তরিকতা, সহযোগিতা, প্রচেষ্টা, নিয়মিত যোগাযোগের ফলে সিদীপ ভোলাচং ব্রাঞ্চের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বলতে হবে রেল এখন থামবে। এরকম ৪টি স্টেশনে রেল থামবে: নখপুর স্টেশন, চুলপুর স্টেশন, দাঁতপুর স্টেশন ও পোশাকপুর স্টেশন। নখপুর স্টেশনে যখন রেল থামবে তখন সকল ছাত্রছাত্রীদের নখ দেখতে হবে। ঠিক অন্যান্য স্টেশনগুলোতে তেমনি করে দেখতে হবে। এতে শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে সচেতন হয়। এই কাজগুলো আমি নিজে করে শিক্ষিকাদের শিখিয়ে দেই। যার ফলে শিশুরা আনন্দ পায় এবং স্কুলে আসতে মনোযোগী হয়। এছাড়া প্রত্যেক সপ্তাহে ১ দিন বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। নাচ, গান, কবিতা-ছড়া আবৃত্তি, ছবি আঁকা ইত্যাদি করা হয়। সকলকে একত্রে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নাচ শিখানো হয় যা থেকে তারা অনেক আনন্দ পায়। প্রতিটি শিশুকে মানবিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সেই মানবিকতা, যাতে উড়তে পারে না যে পাখি সে যদি আহত হয় তাহলে শিশুও দুঃখ পায়। প্রতিটি রিফ্রেশার্স হয় প্রাণবন্ত। রিফ্রেশার্সের দিন ব্রাঞ্চ অফিস শিক্ষিকাদের আনন্দ মেলা হয়ে ওঠে। উৎসবে মেতে ওঠে সবাই। প্রতিটি রিফ্রেশার্সে একজন গানের শিক্ষক অতিথি হিসাবে আসেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সঙ্গীত সুর করে তিনি শিক্ষিকাদেরকে শিখিয়ে দেন। হাজিরা খাতায় ছাপানো গানগুলো শিক্ষিকাদেরকে শেখানো হয় যাতে তারা স্কুলে শিশুদেরকে শিখাতে পারেন। প্রত্যেক মাসে ভালো স্কুল পরিচালনার জন্য ১ম, ২য়, ৩য় স্থান নির্ধারণ করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে উৎসাহ দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষিকাদের মাঝে ভালো কাজ করার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

ভোলাচংয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার ভাল। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তারা ১ম, ২য়, ৩য় স্থান লাভ করছে।

শিশুরা পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে স্কুলে আসে। শিক্ষিকারাও পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে ক্লাস নেন। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিকা, অভিভাবক, এলাকার মুরুব্বি, জনপ্রতিনিধি, ব্রাঞ্চের সকল সহকর্মী সবাই মিলে আমরা একটা টিম। প্রত্যেকের আন্তরিকতা, সহযোগিতা, প্রচেষ্টা, নিয়মিত যোগাযোগের ফলে সিদীপ ভোলাচং ব্রাঞ্চের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি জেনে সংস্থার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। বছর শেষে দেখা যায় বাড়তি উৎসাহ। চলে আসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। এই উৎসবে মেতে উঠে ভোলাচংয়ের সকল শিক্ষাকেন্দ্র। নির্দিষ্ট দিনে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের। ৩ থেকে ৪টি স্কুল মিলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া গান, নাটক, ছবি আঁকা ইত্যাদি উপস্থাপন করে আমাদের কেন্দ্রের ক্ষুদে বন্ধুরা। যা এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করছে এবং সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমাদের এই কর্মসূচি স্কুল থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে সাহায্য করছে। কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর, কেউ রবে না নিরক্ষর– এ আহ্বানের সঠিক বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।

লেখক
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ভোলাচং, সিদীপ

ওমর আলীর কাব্যে ইতিহাস চেতনা

ড. আশরাফ পিন্টু

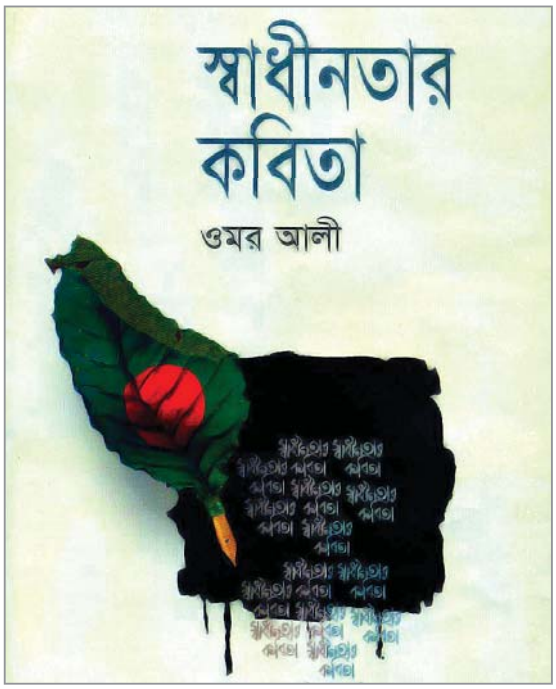

ওমর আলীর কবিতায় ইতিহাস চেতনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি: ১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস চেতনা, ২. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক ইতিহাস চেতনা, ও ৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস চেতনা।

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস চেতনা: ওমর আলীর কবিতায় প্রস্তর যুগ, নিওলিথিক যুগ, হামুরাব্বি, সিন্ধুরাজা, মোগল সম্রাট প্রভৃতির কথা এসেছে। এসব প্রসঙ্গ এসেছে কখনো উপমা হিসেবে, কখনো খণ্ডাংশে, কখনো পরিপূর্ণ কাহিনী হিসেবে। যেমন "ভালোবাসার দিকে" কাব্যগ্রন্থের 'এ তো ছিল না' কবিতায় এসেছে উপমা হিসাবে–

প্রস্তর যুগেও কেউ জানতোনা নিওলিথিক যুগের মাথার খুলি
/ভরে কিংবা মদ খাওয়া এতো হয়নি নারীকে এত অপমান আর অবহেলা ...

"প্রস্তর যুগ তাম্রযুগ" শিরোনামে কবির একটি কাব্যগ্রন্থই আছে। এ কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় কবির খেদ যেন সবেগে ঝরে পড়ে। আধুনিক সভ্যতার নগ্ন সংস্কৃতি, মানব-মানবীর আধুনিকতা কবিকে করেছে বেদনাহত। তিনি অভিমানের সুরে যুগকে সম্বোধন করে বলেছেন–

কষ্ট করে আমার সঙ্গে এত দূর এসে
হে প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, হে স্মৃতি
আমাকে এগিয়ে দেবার তেমন প্রয়োজন নেই।

এক ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় "মুহাম্মদ বিন কাশিমের তরবারি" কবিতাটিতে–

ক্রুদ্ধ হাজ্জাজ পাঠালেন বারোশত তরবারিসহ বারোশত সৈন্য
/আর তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাশিমকে সেনাপতি করে
দু ধারি তরবারি দিয়ে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ওরফে শাহজাদা সেলিম ও আনারকলির ঐতিহাসিক প্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে "একটি গোলাপ" কাব্যগ্রন্থের 'আনারকলি' শিরোনামের নাট্যগুণ সমৃদ্ধ কবিতাটিতে। সেলিমের মুখে আনারকলির সৌন্দর্যের স্তব–

আনারকলি সে ঠিকই ডালিমফুলের রক্তকলি
বসরাই গোলাপ তার কাছে তুচ্ছ ...

২. ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক ইতিহাস চেতনা: ওমর আলীর কবিতায় মা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমতা প্রকাশিত হয়েছে। তার একুশে চেতনা ভিত্তিক যে কয়েকটি কবিতা রয়েছে সবগুলোতেই মাতৃভাষার প্রতি কবির অকৃত্রিম দরদ লক্ষ্য করা যায়। "শুধু তোমাকে ভালো লাগে" কাব্যগ্রন্থের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাটিতে মাতৃভাষার প্রতি এক ভিন্নমাত্রার আবেগ পাওয়া যায়–

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গোলাপও
নিজের সুরভিত লাল কথাটি বলছে
সে ভাষা রক্তিম যেন রক্তপদ্ম ...

এই 'রক্তগোলাপ' 'রক্তপদ্ম' রূপভাষা ছিনিয়ে আনতে আমাদের দামাল ছেলেরা রাজপথে বুকের তাজারক্ত ঢেলে দিয়েছিল। তাদের কণ্ঠেও তাই রক্ত শপথের বাণী–

মাগো তোমার ভাষা রক্ষার জন্যে আমি লক্ষ লক্ষ বার
বুকের রক্ত দিয়ে লাল করে তুলবো পিচঢালা রাজপথ

(বরকত রফিক সালাম জব্বার বিদ্যাসাগর: রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছিলাম নয় মাস)

আর আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে কবিকে আরো অনুপ্রাণিত করে, কবি বলেন–

যেমন আমেরিকায় রক্তদানের বিনিময়ে নিপীড়িত শ্রমিকদের
দাবী আদায়ের আন্দোলন তেমনি ভাষা আন্দোলন
(একুশে ফেব্রুয়ারি: মৌমিতামুক্তা)

৩. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ইতিহাস চেতনা: ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাঙালির যে স্বাধিকার চেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল সেই চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে ১৯৭১-এ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা অর্জন একুশের চেতনারই এক সফল প্রতিসরণ। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে অসামান্য অবদান। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে কবিতায় স্বদেশ প্রেমের যে অকৃত্রিম স্ফুরণ দেখা যায় তা আমাদের মহান

মুক্তিযুদ্ধেরই ফল। ওমর আলীর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের এক নিপুণ আলেখ্য চিত্রায়িত হয়েছে। তার প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই রয়েছে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের কোনো দিক। এছাড়া "স্বাধীনতার কবিতা" শিরোনামে তার একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এসব কবিতায় পাওয়া যায় স্বদেশ প্রেমের উপলব্ধির সচকিত উচ্চারণ। স্বাধীনতা কি? সাধারণ মানুষ কী মনে করে, কবি বলেন–

দোচালা ঘরের ডোয়াগুলো মাটি ও গোবর
পানিতে গুলিয়ে পাট মুঠো করে দু-চারদিন পরেই মসৃণ শুধু লেপা
উঠোনে খোলা চুলোয় অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে
দুটো চালসিদ্ধকরা লবণ মরিচ দিয়ে শাকভাজা

(আয়াতুন নেসার স্বাধীনতা)
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ব্যথাতুর সুর বেজে উঠে কবির কবিতায়–

আমি কি আমার স্বাধীনতা পাবো কোনদিন খাঁটি ও নিখাদ
মনে হয়েছিল আর আমার ঠোঁটের সামনে ফুল ফুটবেনা।

(আমি কি আমার স্বাধীনতা পাবো)

যখন অত্যাচারিত মজলুম জনতা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে, তখন কবির দীপ্ত উচ্চারণ–

আমার একটাই অস্ত্র আছে
অভিশাপ।

(অভিশাপ)

"বিপদাপন্ন স্বাধীনতা" শিরোনামের কবিতাটিতে–

দ্রৌপদী ছুটছে আর দাকোপের যুবতী রহিমা
পালাচ্ছে সম্ভ্রম প্রাণ নিয়ে

ওমর আলীর কবিতায় ঐতিহ্য চেতনা এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিকোণ থেকে। লোক-ঐতিহ্য ব্যবহারে তিনি আরো অগ্রসর। তিনি লৌকিক জীবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামে আজন্ম নিমগ্ন থেকেই তিনি কবিতা লিখেছেন। ফলে তাঁর কবিতার শরীর হয়ে উঠেছে লোক-উপাদানে ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট। পাঠক তার কবিতায় পান গ্রাম ও লোকজীবনের প্রকৃত স্বাদ। এ প্রসঙ্গে কবি ও গবেষক মজিদ মাহমুদের উক্তিটি স্মর্তব্য– "নিশ্চয়ই এ বিশ্বাস আমার আছে, যদি ভাবীকালে কোনো কবি কিংবা পাঠক ওমর আলীর কাব্য নিসর্গে ভুলে ভ্রমণ করতে যান, তাহলে সত্যিই তার ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত, রোপিত প্রতীক বৃক্ষরাজি ও উজ্জ্বল লোকজীবনে মোহিত না হয়ে পারবেন না।"

লেখক

সৈয়দ ওয়ালীর কবিতা

উনি

উনি চলে যাচ্ছেন বেশ কিছু নাট্য গল্প কাব্য মগজে নিয়ে
আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি শুধু
উনি চলে যাচ্ছেন রসিককে ঋণী রেখে, অমল স্বর্গের দিকে
উনি চলে যাচ্ছেন, গহীন পরাণ রেখে মননের স্বর্ণ কুটিরে!
উনি চলে যাচ্ছেন আমাদের শিল্পের মহামতি হয়ে!

(সৈয়দ শামসুল হক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালীন কবিতাটি রচিত)

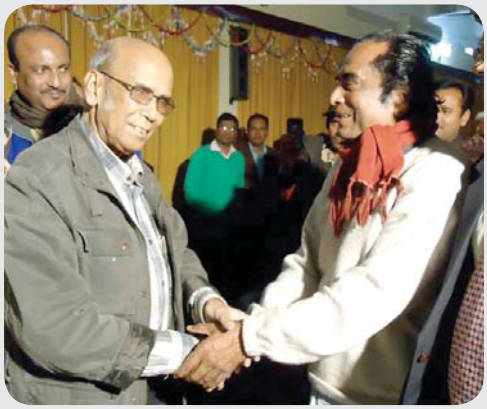

২০১২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক পাবনা এসেছিলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানে আমার প্রিয় মানুষ পাবনার কবি ওমর আলী ও সৈয়দ শামসুল হকের এ ছবি তুলি। সেদিন রাতে সৈয়দ হক তাঁর ভরাট কণ্ঠে নিজের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন– "মানুষ তুমি খাড়া ছিলে ভাঙলে কেন? ..." নৈতিকতার অধঃপতনের এ প্রতিকূল সময়ে কবিতাটি বারবার কানে বাজে।

- আমিনুল ইসলাম জুয়েল

জীবন সংগ্রামে লড়াকু বিধবা মনিকার শিশুকুঞ্জ

মনজুর শামস

প্রকৃতি এখানে সবুজের নিবিড় উচ্ছ্বাস– মেঘের কোল বেয়ে দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে এসে বিকেলের কমলা রোদ সম্ভাবনার বীজ ছড়ায় কচি কচি শিশুমুখের স্বপ্নজমিনে– এখানে, মনিকা রানী শীলের এই উঠোনে– প্রত্যাশার সুপ্ত আকর এই শিশুকুঞ্জে। প্রবহমান দখিনা বাতাস এখান থেকে উড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায় শঙ্কিত বৈধব্যের সকল জড়তা, সকল কুণ্ঠা। ফুল ফোটে আশার, ভালবাসার, সদিচ্ছার আর শুভ কামনার।

মনিকা রানী শীল– বৈধব্যের অনিবার্য বিরূপ পরিস্থিতিকে বদলে নিয়েছেন সুগম সৃজনে। বিধবা হয়েছিলেন ১০ বছর আগে। সামনে কেবলই অন্ধকার দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছিল চোখের গভীরে। দুই সন্তানকে বুকে চেপে ধরে থেকে গেলেন শ্বশুরের ভিটেতেই। তারপর ধীরে ধীরে কালো কালো ধাপ পেরিয়ে সম্ভাবনার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছেন আলোকিত উঠোনে। চাঁদপুর জেলার রামপুর উপজেলার তারাপাল্লা গ্রামের উত্তরপাড়ার শীলবাড়িতে মানে তার শ্বশুরবাড়িতে গড়ে তুলেছেন এক শিশুকুঞ্জ।

বিয়ের আগেই এসএসসি পাস করেছিলেন। বেশ সুখেই ছিলেন বিবাহিত জীবনে। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কোল আলো করে দুই মেয়ে জন্ম নেয়ার পরই স্বামী মারা যান। হঠাৎ এই বিপর্যয়ে নেমে এসেছিল গাঢ় অন্ধকার। গভীর শোক একটু থিতু হতেই সংবিৎ ফিরেছিল– হার মানা চলবে না পরিস্থিতির কাছে; যে করেই হোক মেয়ে দুজনকে মানুষ করতে হবে। শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেবর তার এবং তার সন্তানদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হলেও উপলব্ধি করতে পারলেন তাকে কিছু একটা করতে হবে।

পড়াতে আরম্ভ করলেন প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের। সেলাই জানতেন। ঘরে সেলাই মেশিনও ছিল। শুরু করলেন পাড়া-প্রতিবেশীর সালোয়ার-কামিজ-ব্লাউজ-পেটিকোট সেলাই। সাংসারিক কাজের ফাঁকে, কখনো রাত জেগে, কখনো ভোররাতে উঠে মোটামুটি একটা বাড়তি আয়ের পথ করে নিলেন। স্কুলে পড়ার সময় প্রাথমিক চিকিৎসার ওপর সামান্য চর্চা করতে হয়েছিল। বাড়িতে কারো হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করলে প্রাথমিকভাবে তাকেই সামাল দিতে হতো। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে আসার পর কী করে যেন পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। গ্রামটা চাঁদপুর জেলার রামপুর উপজেলার একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় বলে ২০/২৫ কিলোমিটারের ভেতর কোনো স্বীকৃত ডাক্তার নেই। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হলো বাধ্য হয়ে। ঘরে জরুরি ওষুধ রেখে সামান্য লাভে প্রাথমিক চিকিৎসায় সামান্য আয়ের ব্যবস্থা করে নিলেন।

অন্যকিছু করার উপায়ও খুঁজতে থাকলেন। একদিন জানতে পারলেন সিদীপ নামের এক এনজিও কয়েকজন শিক্ষিকা নেবে। খোঁজ নিয়ে জানলেন অদ্ভুত ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম তাদের। প্রাইমারি স্কুল থেকে ছাত্র ঝরে পড়া রোধে তারা অশিক্ষিত-দরিদ্র মা-বাবার সন্তানদের ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেন স্বল্প-শিক্ষিত গৃহবধূ বা কলেজপড়ুয়া মেয়েদের দিয়ে।

তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি তার উঠোনে চালু করে ফেললেন একটি শিক্ষাকেন্দ্র। সংস্থাটি থেকে খুবই সামান্য একটা সম্মানী দেয়া হয়, তবে এছাড়াও ছাত্রপ্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা নেয়ার অনুমতি রয়েছে সংস্থাটি থেকে। কয়েকদিনেই জমিয়ে ফেললেন তিনি। উঠোনঘেরা বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়ায় যেন স্বর্গের সুখ খুঁজে পেলেন। ভুলে গেলেন সব দুঃখ। অন্তরের ভেতর থেকে উঠে আসা স্নেহ দিয়ে শিশুদের পড়ান বলে তার ছাত্রসংখ্যা বাড়তেই থাকল। সংস্থাটির নিয়ম অনুযায়ী ৩০ জনের বেশি শিক্ষার্থী গ্রহণীয় না হলেও তার ছাত্রসংখ্যা ৩৫। কাকে বাদ দেবেন? কী মায়া সবার মুখে! তিনি বাদ দিলে যদি শিশুটির পড়া বন্ধ হয়ে যায়! দু কুল রক্ষায় একটু চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। সংস্থার হাজিরা খাতায় ৩০ জনের নাম তুলে বাকিদের বাড়তি ছাত্র হিসেবে পড়াতে থাকলেন। দুজন প্রতিবন্ধী শিশুও রয়েছে তার শিক্ষাকেন্দ্রে। তিনি তাদের গভীর মমতায় কথা বলতে, ছবি আঁকতে, পড়তে ও লিখতে শেখান। কোনো স্কুলে এই শিশুদের ভর্তি না করলেও নিরুপায় অভিভাবকরা ভরসা রাখেন তার ওপরেই। তার শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুরা তাদের স্কুলেও ভালো ফল করছে। পাশের প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস ওয়ানে দ্বিতীয় হয়েছে তার ছাত্র আর ক্লাস টুতে মেধাক্রমের প্রথম ৬ জনই তার ছাত্র।

শিশুদের পাঠদানকে তিনি উপভোগও করেন। নিয়মিত খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা করান শিশুদের। সিদীপের রুটিন অনুযায়ী পনেরো দিনে একদিন গ্রামে প্রকৃতি পাঠে যেতে হয়। এদিন তার উঠোনে শিশুদের বই-খাতা রেখে তাদের নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বের হন। হাঁটতে হাঁটতে শিশুদের গাছ-ফুল-পাখি-মাছ চেনান। এক সময় নিরিবিলি বড় কোনো গাছের ছায়ায় বসে গাছের পাতা, কাঠি ইত্যাদি দিয়ে পাখি, ফুল, প্রজাপতি, ঘর, চশমা তৈরি ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে লাগিয়ে দেন শিশুদের। পাশাপাশি তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেন হঠাৎ হাত-পা কেটে গেলে কী করতে হবে, শরীরের কোথাও ঝলসে গেলে কী করতে হবে, আগুন লাগলে কী করতে হবে, ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে এবং কোনো কোনো দিন নিজে পানিতে নেমে শিশুদের সাঁতার শেখান। তারপর গাছতলাতেই আয়োজন করেন ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। শেষে একটু খেলাধুলা করিয়ে তাদের সেদিনের মতো ছুটি দেন।

অন্যের শিশুর যত্ন নিতে গিয়ে নিজের সন্তানদের মোটেও অবহেলা করেন না তিনি। ছোট মেয়ে ক্লাস ফাইভে এবং বড় মেয়ে এবার ক্লাস টেনে। আশা করছেন, সে এসএসসিতে ভালো ফল করবে। নিজেকে নিংড়ে এ দুই মেয়েকে মানুষ করছেন তিনি। জীবনযুদ্ধের জয়মঞ্চে পৌঁছাতে ওরাই যে তার একমাত্র অবলম্বন!

লেখক

কৌতুক...

ফেসবুক থেকে

শিক্ষিকা লুৎফা বেগমের না-বলা অনেক কথা

মো: তারিকুল ইসলাম
রহিমা খাতুন

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার বারইপাড়া গ্রামে ১৯৭৮ সালে লুৎফা বেগমের জন্ম। বাবার নাম সিদ্দিক হোসেন মাস্টার। ৫ ভাই ও ৪ বোনের মধ্যে লুৎফা ৬ষ্ঠ সন্তান। শিক্ষকতার পাশাপাশি তার বাবা গ্রামের আমিনের (জমি মাপা) কাজও করতেন। মা হাজেরা খাতুন একজন গৃহিণী। শত অভাব অনটনের মাঝে তাদের সংসার ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তার বাবার মৃত্যুতে সংসারে আশার প্রদীপ নিভে যায়। তাই লুৎফা বেগমের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পর মাত্র ১২ বছর বয়সে ১৯৯০ সালে একই গ্রামে তার বিবাহ হয়। এই ছোট বয়সে শ্বশুর বাড়িতে সংসারের ঘানি টানতে টানতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেন। একদিন ঢেঁকিতে ধান ভানতে গিয়ে তার হাত চাপা পড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেলে তিনি দীর্ঘদিন আর কাজ করতে পারেননি।

এমতাবস্থায় স্বামী তোফাজ্জল হোসেনকে নিয়ে ১৯৯৬ সালের দিকে গাজীপুর শহরতলী মেশিনটুলস ফ্যাক্টরির নিকট একটি গাছের নিচে ঝুপড়ি তুলে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তার স্বামী দিনমজুরের কাজ করতে থাকেন। আবার অসুস্থতার দরুন প্রতিদিন কাজও করতে পারেন না। অবশেষে বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর ১৯৯৭ সালে তার স্বামী ডুয়েটে দারোয়ানের চাকুরি পান। এদিকে লুৎফা কাজের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি করেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করেন রাস্তার পাশে কিছু দরিদ্র ছেলেমেয়ে খেলাধুলা করছে। তাদেরকে দেখে তার মাথায় একটি ভাবনা আসলো। সে তখন তাদের নামঠিকানা জানার চেষ্টা করল। পরে তাদের বাবা-মার সাথে কথা বলে তাদেরকে নিকটবর্তী গাছের তলায় ঘাসের ওপর বসিয়ে নানা প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে লেখাপড়া শিখাতে লাগলো। যেমন গাছের পাতা, ফলের বিচি, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে। আর মাটিতে এঁকে অক্ষর শিখাতে লাগলো। প্রথমে ৫-৬ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি শুরু হলেও অল্প দিনের মধ্যে ২৫-৩০ জন শিশু যারা একেবারে দরিদ্র পরিবারের তিনি তাদের শিক্ষাদান করতে লাগলেন। এভাবে পড়াতে পড়াতে এলাকায় তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। সেই সুনামকে কাজে লাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে শিশুদের প্রাইভেট পড়ানোর কাজ করতে থাকেন। এমনি করে দশটি বছর কেটে যায়। লুৎফা বেগমের ঘরে ২ ছেলের জন্ম হয়। তাদেরকে একইসাথে বসিয়ে পড়াশোনা করাতে লাগলেন।

১৯৯৮ সালে বেসরকারি সংস্থা প্রশিকার সাথে তার পরিচয় ঘটে। মাসিক ৮০০ টাকা বেতনে তাদের সাথে তিনি শিক্ষকতার কাজ করতে থাকেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় যোগদান করেন। এতে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে। কিন্তু হঠাৎ ২০০১ সালের দিকে প্রশিকার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি কিছুটা বেকার হয়ে যান। তবু অনেক কষ্টে তার টিউশনি ধরে রাখেন।

২০১০ সালে তিনি সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তিনি এসএসসি এবং এইসএসসি পাশ করেন। বর্তমানে তার ২ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে মোঃ লুৎফর রহমান লিমন গাজীপুর রয়েল ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকুরি করছেন। আর ছোট ছেলে মোঃ লোকমান হোসেন রিজন কারিগরিতে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করছেন। বর্তমানে তিনি হাঁপানিতে আক্রান্ত। গাজীপুর শহরের সরকারি হাসপাতালে ও বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে মাঝেমধ্যে সেবা নিয়ে কিছুটা আরোগ্য লাভ করেন। অভাবের সংসারে আবার অসুস্থ হন। এভাবেই চলছে লুৎফা বেগমের জীবন। বর্তমানে তার শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

এ বছর ৪ অক্টোবর সিদীপর ব্রাঞ্চে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষিকাদের মাসিক সভায় এক আলাপচারিতায় এসব তথ্য লুৎফা বেগমের নিজের মুখ থেকেই জানা গেল। তিনি আরো জানান যে, এযাবৎ জেলা পর্যায়ে তিনি কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। নানা কাজের ফাঁকে তিনি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অবদান রেখেছেন। সিদীপ শিসক পরিবারের এই ষাটোর্ধ্ব নারীকে সালাম জানাই।

মো: তারিকুল ইসলাম
এজিএম, সিদীপ

রহিমা খাতুন
শিক্ষা সুপারভাইজার, গাজীপুর ব্রাঞ্চ

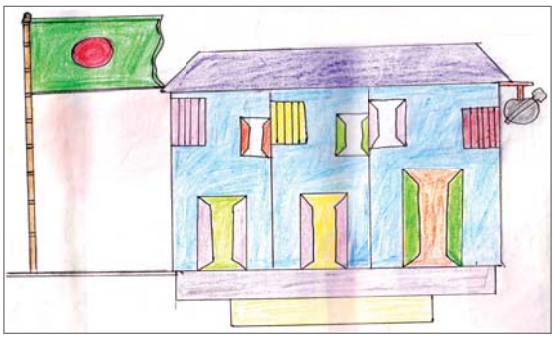

রিভা সুলতানা
২য় শ্রেণি, রাজবাড়ী, গাজীপুর

সকাল
২য় শ্রেণি, রাজবাড়ী, গাজীপুর

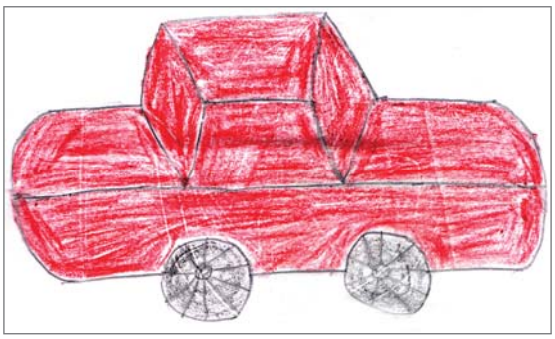

রানী
২য় শ্রেণি, রাজবাড়ী, গাজীপুর

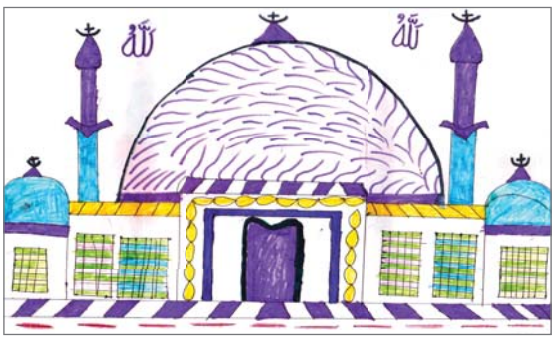

রিমু
২য় শ্রেণি, রাজবাড়ী, গাজীপুর

সাদিয়া আফরিন সাথী
শিক্ষা সুপারভাইজার, অনন্ত শাখা, পাবনা

আমাদের স্কুল

আমাদের স্কুল ঘর কত প্রিয় ভাই
মায়ের সাথে রোজ হেঁটে হেঁটে যাই।
বাঁধপাড়া রোডে সেই স্কুলের ঠিকানা
সারাদিন পড়ি খেলি নেই কোন মানা।
পড়ালেখা কড়াকড়ি ফলাফল ভাল
আমরা একদিন জ্বালাবোই আলো।

মা

মা আমার প্রথম গুরু
তার কাছে শিক্ষা শুরু
ঘুম থেকে উঠি যখন
তার কাছে পড়ি তখন।
মা আমার খেলার সাথী
তার কাছে শিখি বাচনরীতি
স্কুল থেকে ফিরি যখন
দাবা নিয়ে বসি তখন।
মায়ের কাছে করি খেলা
দুঃখ নাই কোনো বেলা
মা আমার হাসিখুশি
তাইতো মাকে ভালবাসি।

নববর্ষ

নিয়মের পথ ধরে দিন আসে যায়
একে একে বারো মাস যখন ফুরায়
নতুন বছর এসে জীবন সাজায়
রঙিন স্বপ্ন নিয়ে বরণ ডালায়।
প্রজাপতির মন নাচে খুশির হাওয়ায়
নতুনের বীণ বাজে সারা বাংলায়
শান্তিসুধা ঝরে সবার আঙিনায়
মাতবো নতুন গানের সুরের মোহনায়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চারগাছে ভিক্ষুক পুনর্বাসন

সেখ সেলিম

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ– এই চেতনাকে ধারণ করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) প্রত্যক্ষ সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উন্নয়নকে একমাত্রিক দৃষ্টিতে না দেখে সার্বিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সমৃদ্ধির লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা যাতে দরিদ্ররা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে পারে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করতে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" শীর্ষক এ কর্মসূচি চলছে। পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন একটি প্রকল্প।

সমৃদ্ধির আওতায় এ প্রকল্পটি সিদীপের চারগাছ ব্রাঞ্চেও চলছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় মুলগ্রাম ইউনিয়নে জুলাই ২০১৪ থেকে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এ পুনর্বাসন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে মালেকা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাকে বলা হয় পুনর্বাসন করা হলে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। সে ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় ফিরে যাবে না এবং কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করবে এই মর্মে লিখিত শর্ত মোতাবেক তাকে পুনর্বাসন করার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

মালেকার সংগ্রামী জীবন: গ্রামের নাম শ্যামবাড়ী। এই গ্রামে বসবাসকারী কয়েকশো পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার মালেকা বেগমের। ছোট্ট একটি ভাঙ্গাচোরা টিনের ঘরে বর্তমানে ১ ছেলে, ৩ মেয়ে ও ৪ জন নাতি-নাতনী নিয়ে সহায়সম্বলহীন মালেকার বসবাস। শারীরিক প্রতিবন্ধী স্বামী শিশু মিয়া ১১ বৎসর আগে মারা যান। স্বামী ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর পরিবারের ৭ জনের খাবার যোগাড় করতে একসময় মালেকা বেগম দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিছুদিন চেয়েচিন্তে চললেও অবশেষে আর কোন উপায় না পেয়ে একদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন এবং সেই সাথে শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবন। গ্রামবাসীদের সহায়তায় ৩টি মেয়ের বিয়ে দিলেও এক মেয়ে মায়ের সংসারে আছে এবং অন্য দুই মেয়ে তালাক-প্রাপ্ত হয়ে তাদের ছোট ছোট ৪ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে মায়ের সাথে থাকে।

তাদের বড় এক ছেলে থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ পরিবারের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং সে পরিবারের কোন খোঁজখবর রাখে না। আনুমানিক ১৩ বৎসর বয়সের বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী ছোট ছেলে, ১৫ বছর বয়সী ছোট মেয়ে এবং চার শিশু সন্তান সহ স্বামী পরিত্যাক্ত দুই মেয়ে নিয়েই ভিক্ষুক মালেকা বেগমের বর্তমান জীবন। সমৃদ্ধির আওতায় পুনর্বাসন: পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জুন মাসে তাকে ২৩,৩০০ টাকা মূল্যের ১টি বকনা গরু, ৩৬,৭০০ টাকার ১টি অটো রিকশা, ৪০,০০০ টাকা দিয়ে ৩০ শতক জমি

সমৃদ্ধির লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা যাতে দরিদ্ররা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে পারে।

বন্ধক রেখে এবং ৩,০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসার জন্য শুটকি মাছ কিনে দেয়া হয়। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সমগ্র কার্যক্রম স্থানীয় পরিষদ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সিদীপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

সিদীপের এই পুনর্বাসন কার্যক্রমকে স্থানীয় জনগণ উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছে। কারণ এর আগে তারা অন্য কোন সংস্থাকে এ ধরনের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করতে দেখেনি। সিদীপকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি এ ধরনের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা মালেকা বেগমের ভাঙ্গা ঘরটি নতুন করে তৈরি করে দিয়েছেন। গ্রামবাসীরা বলেন, সিদীপ যদি একটি অসহায় ভিক্ষুক পরিবারকে সাহায্য করতে পারে তবে আমরা কেন পারবো না। গ্রামের যুবসমাজ একত্রিত হয়ে ঘরটি তৈরি করেছেন।

বর্তমানে মালেকা বেগম অটো রিকসা ভাড়া বাবদ দৈনিক ১৫০ টাকা পায়, শুটকি মাছ বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে যে লাভ হয় তা দিয়ে সে তার দৈনিক সংসারের খরচ চালিয়েও কিছু টাকা করে সঞ্চয় করে। বন্ধকী নেওয়া ৩০ শতক জমিতে আমন ধান চাষ করেছে এবং ধানও ভাল হয়েছে। সে আশা করছে, জমি থেকে অনেক ধান পাবে। এছাড়া বকনা গরুটিও সঠিকভাবে লালনপালন করার ফলে ইতিমধ্যে বেশ বড় হয়েছে এবং সেটির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন জীবন: সিদীপের কর্মীদের পরামর্শে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে তার দৈনিক আয় থেকে প্রতিদিন কিছু টাকা সঞ্চয় করার লক্ষ্যে সিদীপের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় শ্যামবাড়ী গ্রামের ১৩১ নং সমিতিতে ভর্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে সে তার সঞ্চয়কৃত টাকা থেকে রিকশাটি মেরামত করেছে এবং গরু রাখার জন্য গোয়াল ঘর তৈরি করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সিদীপের এই পুনর্বাসন কার্যক্রম একদিকে মালেকা বেগমকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি তাকে সমাজের অন্য দশজনের ন্যায় সম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকার দিয়েছে।

লেখক
জিএম, সিদীপ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
এ্যাসি. ম্যানেজার (অডিট)

অনুপ্রেরণা

আমি কবিতা লিখিনি
বলতে এসেছি জীবনের কথা।
আমি রঙ-রস দেখিনি
দেখেছি শুধু জীবনের হাহাকার।

কিন্তু আমার পাশেই রয়েছে মহান
হৃদয় জুড়ানো এক হাসিমাখা মুখ।
যার প্রেরণায় আমি আর তুমি
বিষণ্ন বদনেও জীবনের বারতা পাই।

তাইতো আমরা সবাই
তার আলিঙ্গন ও ভালোবাসা
পাওয়ার প্রত্যাশায় রই।

মাহফুজা খাতুন
শিক্ষা সুপারভাইজার, হরিষপুর শাখা, নাটোর

কষ্ট হলে

খুব নিশিতে কষ্ট হলে
মাথা রেখ চাঁদের কোলে।
তবুও যদি কষ্ট হয়
চোখ রেখ আমার চোখে।
কষ্ট রেখ না বুকের মাঝে
পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।

স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশরাফ আহমেদ

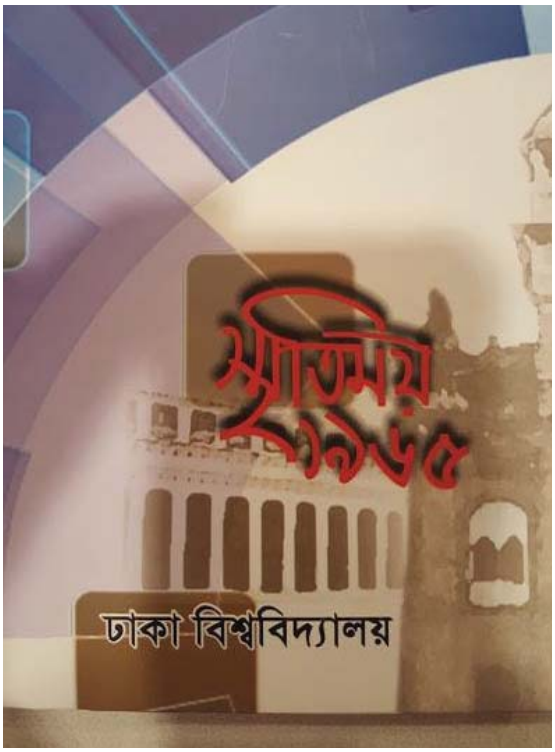

ঢাকায় প্রকাশিত 'স্মৃতিময় ১৯৬৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি সংকলন আনুষ্ঠানিক পাঠোন্মোচন বা মোড়ক উন্মোচনের আগেই এর সম্পাদক জনাব মাহবুব জামিল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই খুব গৌরববোধ করছি। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বইটি দুদিন আগে ঢাকা থেকে সাথে নিয়ে এসেছে সৈয়দ আবেদের হাত থেকে সৈয়দ তাহসিন আহমেদ।

জনাব মাহবুব জামিল গেল তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে বেশ কটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পাঁচটি বই প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি পড়ে আমি উপকৃত ও চমৎকৃত হয়েছি। কাজেই সংকলনটি যে মানসম্মত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

১৯৬১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং ১৯৬৫ সনে মাস্টার্স পাশ করা ১৯ জন সহপাঠীর বাংলা ও ইংরেজিতে স্মৃতিচারণ সম্বলিত বলে বইটি সেসময়কার একটি মূল্যবান দলিলও বটে।

লেখকদের মাঝে অনেকেই সামাজিক, পেশাগত ও সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের সুপরিচিত জিয়াউদ্দিন চৌধুরি স্যারের একটি লেখাও আছে। তিনি আমলা হিসেবে সরকারি চাকুরিতে ঢোকার আগে এক বছরের কিছু বেশি সময় ঢাকা কলেজে পড়িয়েছিলেন। সে হিসেবে আমার স্যার। তার লেখাটি আমি আগেও পড়েছি, অন্যত্র।

সম্পাদকের পঁচানব্বই জন সতীর্থের বিভাগীয় পরিচিতি ও ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, এবং ১৯৬৫ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসও বইটির বাড়তি আকর্ষণ।

কাজটি অতি দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই। এখানেই জানলাম যে মোট চব্বিশ জনের মাঝে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট উপাধি দিয়েছিল।

সাতচল্লিশ জন সতীর্থ যারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে মাহবুব জামিল পরম বন্ধুবাৎসল্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। তার নিজের স্মৃতিচারণটিও তৎকালীন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের অনেক তথ্যপূর্ণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

২৩৫ পৃষ্ঠার এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন তার আরেক সহপাঠী ডেনিস দিলীপ দত্ত ঢাকার মীরপুর থেকে। নিজ স্মৃতিকথায় তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অনেক অজানা তথ্য উপহার দিয়েছেন। মূল্য ১৫০ টাকা।

আমাদের স্থানীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইদের সংগঠন 'ডুয়াফি' (Dhaka University Alumni Forum, Inc) এবং অন্য যে কেউ ভবিষ্যতে এধরনের উদ্যোগের কথা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এতে অন্যকিছু না হোক অন্তত বন্ধুদের মাঝে যোগাযোগটা শক্ত হয়ে থাকবে।

৩১ আগস্ট ২০১৬, পটোম্যাক, যুক্তরাষ্ট্র

আশরাফ আহমেদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।

কৌতুক...

একটা জিনিস আমি এখনও
বুঝে উঠতে পারিনি..
প্রথম ঘড়ি
যে আবিষ্কার করল
তাকে টাইমটা
কে বলে দিল?

বাদল সৈয়দের জলের উৎস
ভালবাসা, ষড়যন্ত্র ও মানবতার উপন্যাস

মো: জাহিদুল ইসলাম

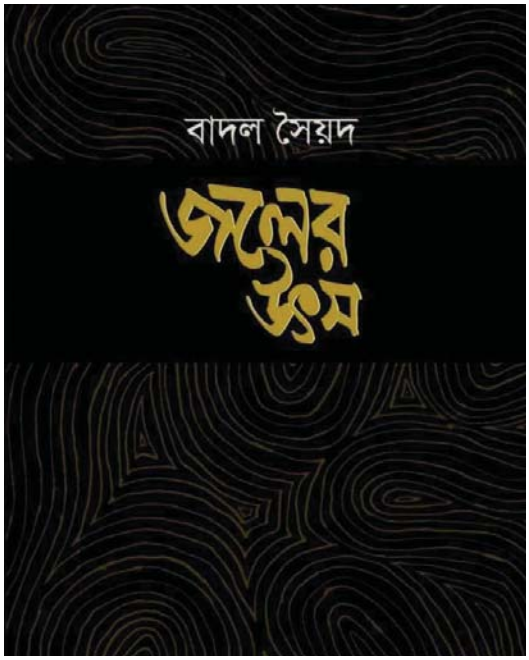

সত্য ও মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য নিজের জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া সম্ভব, জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পদ মহাসচিব হওয়ার স্বপ্নিল ভবিষ্যতকে উৎসর্গ করা সম্ভব; সে গল্পই বাদল সৈয়দ অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন 'জলের উৎস' উপন্যাসে। এছাড়া বাবা ও মেয়ের অসামান্য ভালোবাসার বর্ণনাও সাহিত্য রসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে।

১৯৯১ সালে আমেরিকা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য রাসায়নিক অস্ত্র আছে এমন মিথ্যাচার করে ইরাক আক্রমণ করে। ইরাকের অসহায় মানুষের ওপর চালানো হয় অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের নামে ভয়ঙ্কর প্রলয়। সেই সময় জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন বাংলাদেশের কৃতি সন্তান নূরুল আলম যিনি ছিলেন জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য মহাসচিব। তিনি সেই সময় দায়িত্বের অংশ হিসেবে ইরাক সফরে গিয়ে সেখানে লক্ষ লক্ষ অসহায় ও ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ প্রত্যক্ষ করেন যা তার বিবেককে দংশন করে। বিবেকের তাড়নায় মানবতা ও সত্যের পক্ষে তিনি জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরোধিতা করে ওয়াশিংটন পোস্টে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারে বেরিয়ে আসে গভীরের অনেক অজানা গল্প। সমালোচনার শিকার হয়ে তিনি তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অসাধারণ মিথ্যাচার আর অন্যায় যুদ্ধের সত্যতা উন্মোচন করেছিলেন বলে তিনি শুধু লোভনীয় চাকরিই হারাননি, সেই সময় বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা তার প্রতি একরকম মৃত্যু পরোয়ানাও জারি করে।

নূরুল আলম নানারকম বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে জীবনের নিরাপত্তার জন্য ফিরে আসেন মায়ের কোলে– নিজ দেশে। কিন্তু দেশে ফিরে প্লেন থেকে নামার পরপরই তিনি নিখোঁজ হন। ২৩ বছর পর তাকে খোঁজার জন্য, তার নিখোঁজের রহস্য উন্মোচন করার জন্য বেরিয়ে পড়েন তার যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী মেয়ে ইজাবেল যিনি নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। বাবাকে খুঁজতে এসে নানারকম বিড়ম্বনার শিকার হন ইজাবেল। যদিও ইজাবেল তার কাজ সহজভাবে করার জন্য এবং সকলের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তার সাথে নিয়ে আসেন মার্কিন সিনেটরের চিঠি। তারপরও তিনি সম্মুখীন হন নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার। ইজাবেল দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব আলতাফ হোসেন, 'দৈনিক সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক গওহর জামিল, আমেরিকান অ্যাম্বেসির রাজনৈতিক কাউন্সিলর টমাস হার্ডি, সাবেক গোয়েন্দা এজেন্সির চিফ জেনারেল জামশেদ রাজা প্রমুখ। ইজাবেল আরো দেখা করেন তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মতিউর রহমানের সাথে– যিনি বিশ্বব্যাংকের বিকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ছুটে যান তার পিতৃভিটে চট্টগ্রামের গোমদন্ডী গ্রামে। যেখানে তার বাবা বেড়ে উঠেছেন, মাঠে খেলে ও দৌড়ে বড় হয়েছেন ও সবুজ ঘাসের উপর ছুটে বেড়িয়েছেন। তাই তো ইজাবেল তার বাবার শহরে এসে জুতো খুলে হাতে নিয়েছে। কারণ তার বিশ্বাস বাবার শহরে জুতো পায়ে হাঁটা উচিত হবে না। সেখানে তিনি দেখা করেন তার চাচা মোখতার আহমদের সাথে। স্বপ্নগ্রাম গোমদন্ডীতে ইজাবেল তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় কাটান। যদিও ইজাবেলের আগমনে মোখতার আহমদ ও তার পরিবারকে পড়তে হয় অবর্ণনীয় বিপদের মুখে।

কারো কাছ থেকে কোনরকম তথ্য বা সাহায্য না পেয়ে যখন ইজাবেল হতাশায় নিমজ্জিত ঠিক তখনই তার বন্ধু কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ফ্রেডের পরামর্শে ছুটে যান প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল সার্চ কাউন্সিল ফর মিসিং পারসন্স নামে সংগঠনের কাছে। যে সংগঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী হারানো ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে এবং মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে নিখোঁজ ব্যক্তিদের নিয়ে তার আলাদা একটি ডেস্কও আছে। প্যারিসে বসবাসরত ইজাবেলের আরেক বন্ধু সিল্কের সহায়তায় তিনি

সংগঠনটির কিউরেটর অলিয়স মলিয়রের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপরের সাতদিন ইজাবেল তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায় এরকম তথ্য পাওয়ার জন্য তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকেন ইন্টারন্যাশনাল সার্চ কাউন্সিল ফর মিসিং পারসন্স-এর সমস্ত আর্কাইভ। সবশেষে সংগঠনটির কিউরেটর অলিয়স মলিয়রের পরামর্শে ইউএন-এর হারানো কর্মীদের ডাটাবেইজ চেক করেন। এরপর থেকে 'জলের উৎস' উপন্যাসে অন্ধকারে ঘেরা রহস্যের পর্দা উন্মোচন হতে থাকে।

তিনি দেখতে পান তেইশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভদ্রলোক তার বাবাকে খুঁজে বের করার জন্য সার্চ কাউন্সিলকে চিঠি লিখেছিলেন। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিশ্বব্যাপী মেইল করে নূরুল আলম সাহেবের নিরাপত্তার জন্য মানবিক আবেদন জানিয়েছিলেন। উচ্ছল যৌবন বিসর্জন দিয়ে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খোঁজে আত্মনিবেদনকৃত কিউরেটর অলিয়স মলিয়রের কাছে মানবিক বোধের দাবি নিয়ে ইজাবেল তার বাবার খোঁজে চিঠি লেখা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মানুষটির প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। ইজাবেলের কষ্টকে অনুভব করে মানবিক কারণে অলিয়স মলিয়র সার্চ কাউন্সিলের কঠোর নিয়ম ভাঙেন। ইজাবেল জেনারেল জামশেদ সাহেবকে ফোন করে বিনয়ের সাথে পনের মিনিট সময় চান। সাক্ষাতে ইজাবেল তার সাথে তার বাবার প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে তুলে ধরে বাবা ও মেয়ের মাঝে পবিত্র সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে জেনারেল জামশেদ সাহেবের কাছে তার বাবার শেষ পরিণতির কথা জানতে চান। জেনারেল জামশেদ তেইশ বছর আগের ঘটনা ইজাবেলকে বলতে থাকেন।

জেনারেল জামশেদ তখনকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে কনভিন্স করেছিলেন। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন নিয়ে তিনি নূরুল আলম সাহেবের কাছে একটি আশ্রয়ের কথা জানতে চান যার ঠিকানা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সারা বিশ্বে ইনটেলিজেন্স কম্যুনিটি ভিনদেশে তাদের স্লিপিং এজেন্ট মেইনটেইন করে। যার নিকট জরুরি প্রয়োজনে আশ্রয় নেয়া সম্ভব এবং সেই ঠিকানা আশ্রয়গ্রহণকারী ছাড়া আর কেউ জানবে না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও একজন স্লিপিং এজেন্ট ঠিক করা হয়। যার নাম রমা কৃষ্ণা। যিনি একজন ফার্মাসিস্ট। দরিদ্র এইডস রোগীদের জন্য কম দামী ঔষধ আবিষ্কার করে তিনি প্রায় দেবীত্ব অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে আফ্রিকায় হাজার হাজার বিপন্ন এইডস রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। জেনারেল জামশেদকে নূরুল আলম সাহেব রমা কৃষ্ণার নাম বলেন। সার্জারি করে নূরুল আলমের চেহারা পরিবর্তন করে রমা কৃষ্ণার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

রমা কৃষ্ণা ব্যাংককে রামকামহেং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ইজাবেল রমা কৃষ্ণার সাথে সাক্ষাৎ করেন। 'রেডিও সাইলেন্স ইজ ওভার। দ্যা রোজ উইল বি ভিজিটিং ইউ। প্লিজ হ্যান্ড ওভার দ্যা গিফট'– জেনারেল জামশেদের নিকট থেকে রমা কৃষ্ণা এ মেইলটি পেয়ে বুঝতে পারেন নূরুল আলমকে খোঁজার জন্য তার মেয়ে আসবেন। রমা কৃষ্ণা ইজাবেলকে তার সাথে নূরুল আলমের সম্পর্ক ও নূরুল আলমের পরবর্তী অজানা গন্তব্য সম্পর্কে খুলে বলেন। নূরুল আলমের পরবর্তী গন্তব্য হয় বতসোয়ানার রাজধানী গ্যাবরনে। গল্পের এখানেই উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। নূরুল আলমের পরবর্তী আশ্রয়দানকারীর নাম ভার্গান। ইজাবেলকে ভার্গানের নিকট একটি পাসওয়ার্ড বলতে হয়। আর তা হলো- 'মরুভূমির কোথায় যেন জলের উৎস তৈরি হয়েছে। চলো সেই জলের উৎস খুঁজে বের করি।' লেখকের কথায় তার অর্থ– 'নূরুল আলমের বেদনার্ত চোখের নীল জলে মরুভূমিতে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর তার আদরের কন্যা ইজাবেল যেন সেই চোখের জলের উৎসের সন্ধান করতে করতে তার কাছে পৌঁছায়।' ভার্গানের সাথে সাক্ষাতের পর ইজাবেলের পরবর্তী গন্তব্য হয় কালাহারি মরুভূমি। বিস্তীর্ণ মরুভূমির বুকে বামবুটি সম্প্রদায়ের বসবাস। অনেক দূরে মরুভূমির মাঝে বামবুটি সম্প্রদায়ের রমণী এবং শিশুদের সাথে ইজাবেলের বাবাকেও গোপন আশ্রয়ে রাখা হয়েছিল। ভোরের আলো পেরিয়ে বিষণ্ন বিকেল পেরিয়ে যখন মরুভূমির বুকে সন্ধ্যা নামছে তখন ছুটতে ছুটতে বামবুটি সর্দার যে জায়গায় এসে থামল সেখানে বিরাজ করছে সুনসান নীরবতা। তীব্র বেদনা নিয়ে স্তব্ধবাক ইজাবেল দেখলো ছোট্ট সে জায়গাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে তিনটি অদ্ভুত সুন্দর মরুফুলের ঝোপ। পরম ভালোবাসায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা ফুলগাছগুলোর বর্ণিল রং চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভালোবাসার তরল কুয়াশা। ইজাবেল জলের উৎস খুঁজে পায়। তার বাবার চোখের জলের উৎস।

'জলের উৎস' উপন্যাসে একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, সেটা হলো লেখক পুরো উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বিভিন্ন সৌন্দর্য ও সুখদুঃখকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইজাবেলের পিতৃভিটে চট্টগ্রামের গোমদন্ডী গ্রামের সৌন্দর্য, রাতের ঢাকা শহর, নিউইয়র্ক ও রুজভেল্ট আইল্যান্ডের রাতের সৌন্দর্য, প্যারিসের সিন নদীর অপূর্ব রূপ এবং বতসোয়ানার রাজধানী গ্যাবরন ও কালাহারি মরুভূমির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি লেখক ইজাবেলের সৌন্দর্যকে নানান উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

সুন্দর প্রচ্ছদে সাজানো নানা ঘটনাপ্রবাহ ও রহস্যে ভরা ছোট আকারের উপন্যাসটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিবু কুমার শীল আর প্রকাশক চট্টগ্রামের বাতিঘর। লেখক কর্মজীবনে দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা এবং তার সাহিত্যাদর্শকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন 'জলের উৎস' উপন্যাসটিতে।

মো: জাহিদুল ইসলাম

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৬

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভা। সংস্থার সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাহী পরিচালককে সভা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্যসূচি অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির ওপর নির্মিত ২টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। একটি ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নির্মিত, অপরটি সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের উপর। প্রামাণ্যচিত্র দুটি সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠে। এরপর নির্বাহী পরিচালকের অনুরোধক্রমে ডিজিএম (অর্থ) গত অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ করে সংস্থার আর্থিক অবস্থানের ওপর (মোট ঋণস্থিতি, মোট আয়, মোট ব্যয়, মোট উদ্বৃত্ত, মোট সদস্য সংখ্যা, মোট স্টাফ ইত্যাদি) তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া ডিজিএম (অর্থ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য একটি বর্ষিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এতে সংস্থা আগামী বৎসর কোন খাতে কী উদ্যোগ নিতে পারে তার চিত্র উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে কয়েকজন সদস্য বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। সেসব প্রশ্নের জবাবও নির্বাহী পরিচালক প্রদান করেন।

নিরীক্ষকগণ তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেন এবং তারা জানান যে, সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। তারা জানান, প্রধান কার্যালয়ে ও শাখা পর্যায়ে তারা দুয়েকটি বিষয়ে কাটাকাটি ও ঘষামাজা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আপত্তিকর কিছু পাননি। তাই সংস্থার আর্থিক হিসাব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার বিষয়ে কোন ঘাটতি নেই বলে তারা উল্লেখ করেন।

উপস্থিত সদস্যগণ সিদীপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর মতামত ব্যক্ত করেন। শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রাতের খাবারের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভাটি সফলভাবে শেষ হয়।

কৃষি জরিপ বিষয়ক কর্মশালা

২৭ ও ২৮ নভেম্বর ২০১৬ সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে সিদীপ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস সার্ভের ওপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কৃষি বিষয়ক জরিপ সিদীপ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করা মাহনাজ ইসলাম এবং পাথওয়েজ কনসাল্টিং সার্ভিসেস লি. সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করছে। কর্মশালায় মোট ৮টি জেলার ২০টি শাখার ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। ঢাকা সহ ৯টি জেলার ১৫টি উপজেলায় ৮৮টি গ্রামে মোট ১,০০০টি কৃষক পরিবারের ওপর জরিপ কাজ পরিচালিত হবে। এতে কৃষকগণ জানতে পারবেন তার কৃষি জমিতে কী সার কখন কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে। এরফলে কৃষকগণের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে।

সাফওয়ান হাকিম লাদিব
শ্রেণি-কেজি, চিলড্রেন আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা